[২]

লোকসাহিত্যের প্রধান শাখাসমূহ

লোকসংস্কৃতির সাধারণ সব বৈশিষ্ট্যই লোকসাহিত্যের মধ্যে লক্ষণীয়। লোকসাহিত্যের প্রধান শাখাগুলি : ক. ছড়া ; খ. প্রবাদ ; গ. ধাঁধা ; ঘ. লোকসঙ্গীত ; ঙ. লোককথা ; চ. গীতিকা ও ছ. লোকনাটক।

ক. ছড়া

ছড়া লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা। 'ছড়া' শব্দটি দেশজ। ছড়া সর্বকালের আদিম কবিতার বীজ। ছড়া একদিকে পুরাণ ইতিহাসের ছায়া অন্যদিকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য দৃষ্টান্ত। যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর *বাঙ্গালা শব্দকোষ* (২য় খণ্ড)-তে 'ছড়া' সংস্কৃত 'ছটা' শব্দ থেকে আগত জানিয়েছেন। এর অর্থ "শ্লোক পরম্পরা"। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত *বিশ্বকোষ* (৬ষ্ঠ খণ্ড)-এ ছড়াকে বলা হয়েছে বিস্তৃত পদ্যবিশেষ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ ছড়ার অর্থ করেছেন গ্রাম্যকবিতা। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (২য় সং)-এ ছড়াকে বলা হয়েছে ছন্দোবদ্ধ পদপরম্পরা। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে ছড়াকে শ্লোকও বলা হয়। বস্তুত মধ্যযুগে সমনামরূপে শ্লোক—শিক্‌লি বা ছিক্‌লির প্রচলন ছিল। শৃঙ্খল বা শেকলের মতো এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশ ছড়ায় গ্রথিত থাকে। আভিধানিকদের মতে, ছড়ার সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাঙলাকাব্য ও সঙ্গীতধারার যোগ ছিল। মধ্যযুগীয় সাধারণ জনজীবনে ছড়া নারী ও পুরুষ সমাজে সমভাবে প্রচলিত ছিল। এই কারণে ছড়াকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, গানের মধ্যে ছড়ানো আর পরপর গ্রথিত—এই হল ছড়া। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভবকাল থেকেই এই শাখাটির বিকাশ। বাঙলা ছড়ায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যায় :

১. ছড়ায় যুক্তিসঙ্গত বা বিশিষ্ট ভাব কিংবা ভাবের পারম্পর্য নেই ; ২. ছড়ায় ঘটনার ধারাবাহিকতা বা আনুপূর্বিক কাহিনী থাকে না ; ৩. ছড়া ধ্বনিপ্রধান, সুরাশ্রয়ী ; ৪. ছড়ায় রস ও চিত্র আছে, উপদেশ নেই ; ৫. ছড়ার ছন্দ শ্বাসাঘাত ; ৬. ছড়া বাহুল্যবর্জিত, দৃঢ়বদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত ; ৭. ছড়ার ভাষা লঘু ও চপল ; ৮. ছড়ার রস স্নিগ্ধ ও সরস।

ইংরেজিতে ছড়ার যেমন নানা শ্রেণীবিভাজন দেখা যায়—Nursery Rhyme, Game Song, Dance Song, Cradle Song প্রভৃতি, তেমনি বাংলা ছড়ারও বিভিন্ন শ্রেণীবিভাজন দেখা যায়। সাধারণভাবে বাংলা ছড়াকে প্রাথমিক পর্যায়ে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—প্রতিটি বিভাগে আবার একাধিক উপশ্রেণী থাকে।

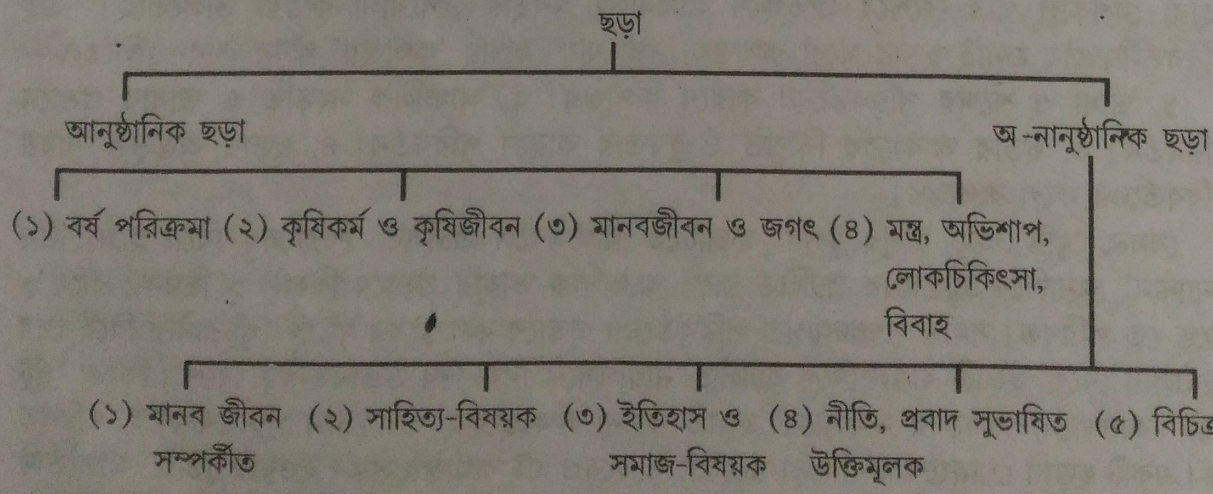

লোকসাহিত্য-গবেষক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ছড়াকে ছয়টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন (বাঙলার লোকসাহিত্য ২য় খণ্ড) এইভাবে—১. শিশুবিষয়ক (নিদ্রা, ছেলেখেলা, বিবিধ), ২. নারীবিষয়ক

(কন্যা, পরিবার, আচার, ব্রত), ৩. পশুপক্ষী বিষয়ক, ৪. প্রকৃতি বিষয়ক, ৫. সমসাময়িক ঘটনানির্ভর ও ৬. উপকথার ছড়া। ছড়াকে বহুকাল ধরে শিশুসাহিত্য রূপেই মূল্যায়ন করা হত কিন্তু ছড়া সর্বত্রই বয়স্কলোকের সৃষ্টি। বঙ্গীয় লোকসাধারণের সবরকম প্রকাশভঙ্গীর একটি সর্বজনস্বীকৃত চিরাচরিত ভঙ্গি। আপাতদৃষ্টিতে ছড়ার মধ্যে একটি 'অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত' ভাব বা ভঙ্গী ধরা পড়ে। ভাবের ধারাবাহিকতা বা কার্যকারণসূত্র রক্ষিত হয় না কেবল সুর ও ছন্দের সঙ্গতি রক্ষা করা হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ সরকারকৃত খুকুমণির ছড়া-র ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে শিশুবুদ্ধি এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক দেখে না। রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়ার আলোচনায় এই অসংলগ্নতার কারণ হিসেবে নিয়মবন্ধনহীন শিশু মনস্তত্ত্বের সমধর্মী মানসিকতা—স্বপ্নদর্শিতা, অবচেতন ভাবের আকস্মিক কার্যকারণসূত্রবিহীন আত্মপ্রকাশকে দায়ী করেছিলেন। অন্যদিকে রামেন্দ্রসুন্দর মনে করেন, এই অসংগতির কারণ আদিম মানুষের মনস্তত্ত্বের প্রভাব। এমন কতকগুলি ভাব বা ঘটনা আছে আদিম সমাজে যা আজ অসংগত বলে মনে হতে পারে। আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষকদের মতেও এই অসংলগ্নতার জন্য দায়ী পরিণত মানুষেরই আদিম স্তরের সারল্য, মনের নিয়মবন্ধনহীনতা। এ প্রসঙ্গেই অবনীন্দ্রনাথ ছড়াকে ক্যালিডোস্কোপের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর মতে 'ছড়ার রাজ্য চিরদিনই অর্ধেক কল্পনার, অর্ধেক বাস্তবের।' তাছাড়া লোকমানসের কতকগুলি নিজস্ব প্রতীক-সংকেত আছে, যেগুলি ছড়াতে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি সবসময় ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না, হলে ছড়াকে পারম্পর্যহীন রচনা বলে অনেক ক্ষেত্রেই মনে হত না। বস্তুত ছড়ার রচনারীতি Telegraphic, এখানে বাক্যকে অসম্পূর্ণ রাখা হয়, স্পষ্ট বিবৃতির পরিবর্তে ইশারা-প্রতীক, বক্তব্যের সার ব্যবহৃত হয়। অল্প কথায় অনেক কথা বলার প্রবণতা থাকে বলে মাঝে মাঝে বক্তব্যকে অর্থহীন মনে হয়। আর এই ধরনের শিল্পরীতিতে এক প্রকার abstraction আছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিমূর্ততাকে নৃতাত্ত্বিকেরা লোকমানসের বৈশিষ্ট্য বলেছেন যা লোকশিল্পের অন্য শাখাগুলিতেও প্রতিফলিত। যথাযথভাবে প্রকাশ করার কোনও প্রয়াস লোকমানসের থাকে না বলেই ছড়ার বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে পূর্ণতা খুঁজে পাওয়া যায় না। ছড়ার কায়ানির্মিতিতে আরও যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল—লোকভাষার প্রয়োগ, ধ্বন্যাত্মক শব্দের বহুল ব্যবহার, সহচর শব্দের ব্যবহার, এক বা সমজাতীয় শব্দের পুনরাবৃত্তি, অনাবশ্যক ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ, নামধাতুর প্রয়োগ, লৌকিক উপমা, অতিশয়মূলক উক্তি। ছড়ার রচনাভঙ্গীর নমনীয়তার জন্যে সমাজের সব স্তরে সমভাবে ছড়া আকর্ষণীয়। আর এই আকর্ষণীয় হওয়ার জন্যেই পরিবর্তনশীল যুগপরিবেশ ও সমাজমানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ছড়াও পরিবর্তিত হয়। ছড়ার এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রথম ছেলে ভুলানো ছড়া আলোচনায় আলোকপাত করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, "এই কামগরিতা, কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত। ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল, ইহারা দেশকাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে।" এই পরিবর্তনীয়তার জন্যই ছড়ার মধ্যে কথান্তর দেখা যায়। ছড়ার 'কথান্তর' ঘটার কারণগুলি হল—

১. ভাষা ও শব্দের পরিবর্তনের কারণে রূপান্তর। ২. আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ভাষার প্রভাবে পরিবর্তন। ৩. ছড়ার আকারের বিস্তৃতি ও হ্রস্বতার কারণে পরিবর্তন। ৪. ছড়ার অন্তর্ভুক্ত বিষয় পরিবর্তনের ফলে রূপান্তর।

যেমন, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ছড়াটিতে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত 'শিয়ালের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যাদান' অন্যদিকে চট্টগ্রামের প্রচলিত রূপে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবে শিয়াল > ছিয়াল, রাঁধে > রান্ধে তে পরিণত। সমাজ-সম্প্রদায়গত পরিবর্তনের প্রভাবে কথান্তরের দৃষ্টান্ত 'পুঁটুরানীর বিয়ে দেব হটুমালার দেশে' ছড়াটি বাঙলাদেশে প্রচলিত 'নারগিসকে বিয়া দিব উজানতলীর দেশে'। কিংবা 'পুঁটু নাচে কোনখানে/শতদলের মাঝখানে' ছড়াটি কখনো লক্ষ্যস্থলের পরিবর্তনে পুঁটু খোকাতে পরিণত হয়। একটি ছড়ার শেষাংশে অন্য ছড়া সংযোজিত হয়েও এই কথান্তর সম্ভব হওয়ার দৃষ্টান্ত 'আগডোম বাগডোম' ছড়াটি। যেটি মূলত ছেলেদের খেলার ছড়া, অথচ শেষাংশে মায়েদের প্রসঙ্গ যুক্ত। আবার আনুষ্ঠানিক ছড়াকে যেমন ব্রতের ছড়ায় বিষয় পরিবর্তনে ছড়ার কথান্তর লক্ষিত হয় 'শিবব্রতের ছড়া', 'দশপুতুলের ব্রতের' ছড়ায় রূপান্তরের মধ্যে। কথান্তর ছড়ার এমনই এক বৈশিষ্ট্য যে প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে বলেছেন, "এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।"

ছড়ার মধ্যে যে সমাজজীবন চিত্রিত তা আদিম সময় থেকে মধ্যযুগ তথা আধুনিক জীবনসীমাকেও স্পর্শ করে। আদিম মানুষের জীবন যেহেতু দ্বন্দ্ব-সংঘাতবহুল ছিল, প্রতিপক্ষকে অতিক্রম করার জন্যে প্রয়োজন ছিল ক্ষিপ্রতার, সম্ভবত সেকারণেই ছড়ার খাসাঘাতের মধ্যে এই দ্রুততার ছন্দই ধরা পড়ে। এই আদিম সংগ্রাম প্রেরণাই ধরা পড়ে খেলার ছড়াগুলির মধ্যে। প্রাক্‌-আর্য সমাজের digging পদ্ধতিতে কৃষিকার্য প্রচলনের প্রতিফলন দেখা যায় একাধিক ছড়ায়। (যেমন, 'হাতে কাঁচি কোমরে দা/ভাত খাইলে রাউন্যা যা')। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' রচনাটিতে জানিয়েছেন যে, অস্ট্রিক জাতিই বঙ্গদেশে প্রথম কৃষিকার্য অবলম্বনে সংঘবদ্ধভাবে সুসভ্য জাতি গঠন করে এবং তখন ধান, পান, কলা ও নারকেল ছিল প্রধান কৃষিপণ্য। তাই ছড়ায় বলা হয়েছে 'ধান ফুরুল, পান ফুরুল/খাজনার উপায় কি?' কৃষিই সমৃদ্ধির সূচক, সেইজন্য অভিভাবকের আকাঙ্ক্ষা—'খোকামণির বিয়ে দেব হটুমালার দেশে/তারা গাই বলদে চষে।' মধ্যযুগে শাসনকর্তা তথা রাজার প্রতি লোকসমাজের প্রতিবাদী চেতনাও ধরা পড়ে বহু ছড়ায়, যেমন, 'রাজার বাড়ী বিয়ে হবে, হাজার টাকা দণ্ড।' ছেলেভুলোনো ছড়ায় বা অনানুষ্ঠানিক ছড়াগুলিতে যে জীবনচর্যা তথা সাংসারিক উপকরণ এবং পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার বা খাদ্যাভ্যাসের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে এক আড়ম্বরহীন, সহজ রুচির লোকজীবনের ছবি অঙ্কিত। ছড়াকার গোষ্ঠীটি সম্ভবত কৃষিজীবী এবং ছড়ার নায়িকারা হয়তো কিছুটা ভদ্রসমাজের অংশীদার মনে হয়, কেননা ছড়াগুলিতে বৃত্তিজীবী মানুষগুলিকে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন 'তেলীমাগী', 'কামরানী' বা 'মালী বেটা'—তাতে কিছুটা অবজ্ঞার সুরই শোনা যায়। বস্তুত ছড়ার গণ্ডিবাঁধা ঘরোয়া জীবন পরিবেশ অনেকাংশে নারীসমাজেরই অধিকৃত। শুধু তাই নয়, সাধারণত নারীর ভাষাতেই খাসাঘাত প্রবণতা লক্ষণীয়। নারী সমাজের রক্ষণশীলতাই ছড়ার প্রাচীনতাকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বহুসংখ্যক ছড়ার মধ্যে যেমন আদিম মাতৃতন্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। (কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন/আজ হতে জানলাম মা বড়ো ধন)। আবার ছেলেভুলানো ছড়ায় যেভাবে শিশুকে বিশেষ করে পুত্রসন্তানকে মহামূল্য সম্পদরূপে কল্পনা করা হয়, তার মধ্যে পিতৃতন্ত্রের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। পারিবারিক ছড়াগুলির মধ্যে দুই বোনের সম্পর্ক[১], শাশুড়ি-ননদী-বধূর সম্পর্ক,[২] মামীভাগ্নে সম্পর্ক, বরপণপ্রথা,[৩] বহুবিবাহ,[৪] বিবাহের বয়সের অসাম্যজনিত নারীর অভিযোগ প্রাধান্য পেয়েছে। এমনকি লোকসমাজে যে নারীর পুনর্বিবাহের প্রচলন রয়েছে তার উল্লেখ পাওয়া যায়—"পরের বেটা মারলে চড়/কানতে কানতে খুড়োর ঘর/খুড়ো দিলে বুড়ো বর" ছড়াটিতে। কিংবা "বেগুন হল ফালা ফালা/বৌ পালাল দুপুরবেলা/ওমা এবৌ তো ভালো না" ছড়াটির মধ্যে পরকীয়া প্রেমের ছবি চিত্রিত। যানবাহন, আসবাবপত্র, অর্থনৈতিক বৈষম্যের ছবি,[৫] উচ্চসমাজের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার চিত্র[৬], যেমন পাওয়া যায় সেই সঙ্গে "আগডোম বাগডোম" ছড়াটির মধ্যে ইতিহাসের ছবি[৭] বা বহু

---

১. বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে,/সেই যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী বলে।
২. শাশুড়ী ননদ বলবে দেখে/বৌ হয়েছে কালো/শ্বশুর ভাসুর বলবে দেখে,/ঘর করেছে আলো।
৩. আর্য সমাজের কন্যা ক্রয়ের প্রচলন ছিল। মনু সংহিতাতেও উল্লেখ আছে, মহাভারতে পাণ্ডু শুল্ক দিয়ে মাদ্রীকে ক্রয় করেন তার প্রতিফলন হাজার টাকার বউ কিনেছি/খাঁদা নাকের চুড়ো, কিংবা এত টাকা নিলে বাবা ছাঁদনাতলায় বসে/এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে/আমরা যাব পরের ঘর অধীন হয়ে/পরের বেটি মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে/দুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে।
৪. বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর-এ উল্লিখিত গৌরী দান।
৫. বাঁদীর পুতে বিয়া করে/একশত টাকা দিয়ে/রাজার পুতে বিয়া করে/ঢোমরী ঢুলাইয়া।
৬. কলির বামুন ঢোরা সাপ/যে না মারে তার পাপ।
৭. জগৎশেঠের কড়ি/উনি চাঁদের নড়ি/গোবিন্দরামের ছড়ি। কিংবা ছেলেঘুমালো পাড়া জুড়ালো/বর্গী এলো দেশে।

ক্রমপুঞ্জিত ছড়া যেমন 'আমার কথা ফুরালো'-র মতো রচনায় লোককথার কাহিনী নির্যাস পাওয়া যায়। 'ভূত আমার পুত'-এর মতো মন্ত্রধর্মী ছড়ায় লোকসমাজের জাদুবিশ্বাসের, আত্মা সম্পর্কিত ধারণার ছবি পাওয়া যায়। এমনকি লোকসমাজে সাম্প্রদায়িক জীবন চিত্রটিও পাওয়া যায়—'ডুলকির ভিতর পাকা ধান/ছি, হিঁদুর সোয়ামি মোচরমান'-এর মতো ছড়ার মধ্যে। নারীকে ছড়ার ধারয়িত্রী বলে উল্লেখ করা হলেও মধ্যযুগের ছড়ায় পুরুষ প্রাধান্য যথেষ্ট। মধ্যযুগ থেকেই ছড়া লিখিত সাহিত্যকেও প্রভাবিত করে। আধুনিক উচ্চসাহিত্যে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসে ছড়ার বিচিত্র প্রয়োগ রসাস্বাদ সঞ্চারিত করে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বর্ষামঙ্গল রচনার পাশাপাশি লোকছড়া রসেই ঐতিহ্যময় ভাবনাকে স্মরণ না করে পারেন না—'...কবে বিষ্টি পড়েছিল/বান এল সে কোথা/শিব ঠাকুরের বিয়ে হল/কবেকার সে কথা'' সেইভাবেই বঙ্গীয় লোকসাধারণের জীবনসীমার প্রতিটি প্রান্তে আল্‌পনা রচনা করে রেখেছে ছড়ার ঐতিহ্যময় সর্বজনস্বীকৃত বিচিত্র ভঙ্গিটি। প্রসঙ্গত স্মরণীয় হয়ে ওঠে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রাজ্ঞ মন্তব্যটি ''বস্তুতঃ এই সকল ক্ষুদ্রাহাস্থহীন অর্থহীন অসংলগ্ন কবিতার ভগ্নাংশগুলির মধ্যে এক এক স্থানে গৃহস্থ বাঙালীর গৃহের যে সুস্পষ্ট ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।''[১] সেইসঙ্গে শুধু ছড়ার সামাজিক মূল্যই নয়, লোকসাহিত্য হলেও তার নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যও যে অনস্বীকার্য তা উল্লেখনীয় হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে : ''আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটাই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।''[২]

খ. প্রবাদ

লোকসাহিত্যের এই শাখাটি ছড়ার সঙ্গে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। পাশ্চাত্যের দার্শনিক Bacon একদা বলেছিলেন, "The genious, wit and spirit of a nation are discovered by their provebs." প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রবাদ সম্পর্কটি একটি স্পেনীয় উক্তির ইংরেজি অনুবাদ : "Proverb is a short sentence based of long experience." যথার্থ প্রবাদের মধ্যে একটি জাতির সামগ্রিক জীবনচর্যার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদের সত্যতার মধ্যে রয়েছে সামাজিক সত্য। প্রবাদের আভিধানিক অর্থ : পরস্পর কথোপকথন, পরম্পরাগত বাক্য, কিংবদন্তি, জনশ্রুতি (বঙ্গীয় শব্দকোষ) যদিও ইংরেজি Proverb শব্দের প্রতিশব্দরূপে বহুকাল ধরে প্রবাদ শব্দটি প্রচলিত কিন্তু প্রবাদের আভিধানিক অর্থ Proverb-এর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত নয়। রে, জেমস্ লঙ প্রথম Proverb অর্থে প্রবাদ শব্দটি প্রয়োগ করেন। আভিধানিক অর্থে পার্থক্য থাকলেও প্রবাদের প্রচলিত অর্থ ও ভাব Proverb -এর সম্পূর্ণ অনুরূপ হয়ে উঠেছে। প্রবাদ ব্যক্তিবিশেষ তথা সমাজের বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি, প্রবাদ সমাজ অভিব্যক্তি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। অলঙ্কাররূপকের সহাবস্থানে প্রবাদ সাহিত্যগুণ বিশিষ্ট ও সরস হয়ে ওঠে। প্রবাদ সংক্ষিপ্ত রচনা কিন্তু পূর্ণ বাক্য, যার মধ্যে কর্তা, কর্ম, অসমাপিকা ক্রিয়া সবই থাকে। প্রবাদ তথা Proverb-এর যে সংজ্ঞাটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য সেটি হল W. C. Hazlitt-এর "An expression or combination of words conveying a truth to the mind by a figure, periphrasis, antithesis or hyperbole." (*A Dictionary of American Proverb and Proverbial Phrases)* আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার *লোকসাহিত্য* গ্রন্থে প্রবাদের সংজ্ঞা দিয়ে জানিয়েছেন : "প্রকৃতপক্ষে সমাজ যাহা আচরণ করে এবং সামাজিক মানুষ প্রাত্যহিক জীবনাচরণের ভিতর দিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহাদের মধ্যে যাহা নিজেদের অভিজ্ঞতার দিক দিয়া নিতান্ত তিক্ত, প্রধানতঃ তাহা দ্বারাই প্রবাদ রচিত হইয়া থাকে। প্রবাদ

মধুর বচন নহে, তাহা সংসার সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত মানুষের কঠোর অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি মাত্র।" প্রবাদ নিরক্ষর সমাজের সৃষ্টি হলেও আদিম সমাজ পার হয়ে মানুষ যখন দলপতির তত্ত্বাবধানে জীবননির্বাহ শুরু করেছে, সমাজবদ্ধ হয়েছে তখন থেকে প্রবাদের প্রচলন শুরু হয়। মৌখিকভাবে রচিত হলেও এর রচনাকৌশলে যে সূক্ষ্মতা আছে তা আদিমসমাজের আয়ত্তাধীন নয়। মিশরের প্যাপিরাসে খ্রি. পূ. ৫৫০ অব্দে গল্পের মধ্যে প্রবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম ঋগ্বেদে প্রবাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা প্রবাদকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—১. লৌকিক প্রবাদ, ২. সাহিত্যিক প্রবাদ বা লিখিত প্রবাদ। লিখিত বাঙলা প্রবাদের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় চর্যাপদ-এ।[১] পরবর্তীকালে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ,[২] *কৃত্তিবাসী রামায়ণ*-এ,[৩] *কবিকঙ্কণ চণ্ডী*-তে[৪] এবং *অন্নদামঙ্গল*-এও[৫] বহুল প্রবাদের প্রয়োগ চোখে পড়ে।

প্রবাদের কায়ানির্মিতিতে যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয় সেগুলি হল, প্রবাদ আকারে সংক্ষিপ্ত, পরিক্ষিত অবয়ববিশিষ্ট। গদ্য পদ্য উভয়ই এর অবলম্বন। প্রবাদকে সরস, সাহিত্যগুণ বিশিষ্ট করে তোলার জন্যে কতকগুলি কৌশলের সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন—১. অনুপ্রাসমূলকতা (ওল কচু মান/তিনই সমান) ; ২. তুলনামূলকতা (গাঁ নষ্ট কানায়/পুকুর নষ্ট পানায়) ; ৩. পুনরাবৃত্তিময়তা (উচিত কথায় দেবতা দুষ্ট/উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট) ; ৪. ক্রমিকতা (চোখকে বলি দেখ/কানকে বলি শোন/মুখকে বলি চুপ) ; ৫. বৈপরীত্যময়তা (অভ্যাসে সয়/অনভ্যাসে নয়) ; ৬. প্রশ্নমূলকতা (ভালবাসা কেমন? ভালো বাসো যেমন) ; ৭. দৃষ্টান্তমূলকতা (অতিদানে বলীর পাতালে হল ঠাঁই) ; ৮. রূপকত্ব (আপনার চরকায় তেল দাও) ; ৯. সম্বোধনমূলকতা (চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা)। যেহেতু প্রবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ততা তাই এমন অনেক বাক্য এবং বাক্যাংশ বা শব্দগুচ্ছ আছে যাদের প্রবাদ বলে ভুল হতে পারে কিন্তু সেগুলি প্রবাদ নয়, ওই বাক্যাংশগুলিকে বলা হয় 'প্রবাদমূলক বাক্যাংশ' এবং শব্দগুচ্ছকে বলে 'বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ'।

প্রবাদমূলক বাক্যাংশ : ইংরেজিতে এই শ্রেণীর খণ্ড প্রবাদকে Proverbial Phrase নামে চিহ্নিত করা হয়। এরা প্রবাদের অংশমাত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবাদ নয়। প্রবাদের সাহিত্যিক সৌকর্য, ঐতিহ্যমূলক অভিজ্ঞতার স্পর্শ এদের মধ্যে থাকায় এগুলিকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রবাদ সংগ্রহে প্রবাদরূপেই গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু এরা যথার্থ পূর্ণ প্রবাদ নয়। যেমন, 'এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো', 'রগ ঘেঁসে যাওয়া' ইত্যাদি।

বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ : ইংরেজিতে Idiom-এর বাঙলা প্রতিশব্দ বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ। এরাও প্রবাদরূপে সংগৃহীত হয় কিন্তু এরাও পূর্ণ প্রবাদ নয়। যেমন, 'অকালকুষ্মাণ্ড', 'অক্কা পাওয়া' ইত্যাদি। প্রবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত বা সাদৃশ্যমূলক আর এক ধরনের সৃষ্টি পাওয়া যায়। সেগুলি হল 'বচন'। শব্দটির অর্থ কথন, ভাষণ, অনুশাসন বা আদেশ। বচন প্রবাদের মতোই পূর্ণ বাক্য। বচন দু-ধরনের—কৃষি-বিষয়ক বচনগুলি হল খনার বচন আর জ্যোতিষ বিষয়ক রচনাগুলি ডাকের বচন। প্রবাদের মতো বচনের ক্ষেত্র প্রসারিত নয়, সীমাবদ্ধ। প্রবাদ যেভাবে নারীর গার্হস্থ্যজীবন তথা পারিবারিক জীবন আধারিত, বচন সমাজের বহিরঙ্গ-নির্ভর। যদিও খনার বচনকে খনা নাম্নী মহিলার সঙ্গে কল্পিতভাবে যুক্ত করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এগুলি কৃষিসমাজের আবহাওয়া ও কৃষিবিষয়ক ক্ষণের বচন যার রচয়িতা সমগ্র কৃষিসমাজ। ডাকের বচনও ডাক নামাঙ্কিত মন্ত্রসিদ্ধ গুণী ব্যক্তি-নির্ভর রূপে কল্পনা করা হয়েছে। আসলে এগুলি সামাজিক নীতিবিষয়ক লোকসমাজের কথন।

---

১. আপনা মাঁসে হরিণী বৈরী।
২. ললাট লিখিত খণ্ডন না জাত্র।
৩. পিঁপিড়ার রাখা উঠে মরিবার তরে।
৪. আপনি রাখিলে রহে আপনার মান।

প্রবাদে একটি জাতির ব্যবহারিক জগতের পরিচয়বাহী। প্রবাদ চলমান সমাজচিত্রের সময়বাহী দর্পণ, যা সামাজিক শিক্ষার বাহনও। অধিকাংশ প্রবাদেরই স্রষ্টা ও বাহক নারী। প্রবাদের রূপক ও বক্রোক্তির মধ্যে নারীর স্নেহময়ী প্রেমবিহ্বল কোমল রূপ নয়, সুতীক্ষ্ণ জীবন সমালোচিকার ব্যক্তিত্বময়ী শক্তিময়ী ভূমিকাটি সেখানে প্রতিফলিত। জীবন ও সমাজের প্রতিটি দিককে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ ও ত্রুটি নির্দেশ করেছে প্রবাদগুলি। তাই প্রবাদের বিষয় বৈচিত্র্য বিপুল। যেমন—

১. **সংস্কার-বিশ্বাস-বিষয়ক প্রবাদ** : বিশ্বাস ও লোকসংস্কারের মধ্যে দিয়ে একটি সামাজিক গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন, 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ/ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।' কিংবা 'আগিয়ে দিয়ে দখিন পা/যথা ইচ্ছা তথা যা'।

২. **সামাজিক প্রথা-সম্পর্কিত প্রবাদ** : এই প্রবাদগুলির মধ্যে দিয়ে একটি লোকগোষ্ঠীর কৌলিক প্রথা, সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে জানা যায়। যেমন : 'কার আগুনে কেবা মরে, আমি জাতে কলু/মা আমার কি পুণ্যবতী বলছে দে উলু' সতীদাহ প্রথার ঐতিহাসিক ছবিটি এই প্রবাদে পাওয়া যায়। যে মেয়েটিকে চিতায় তোলা হয়েছে সেই মেয়েটি জাতে কলু, যার সঙ্গে সহমরণে পাঠানো হচ্ছে সে তার স্বামী নয়। অর্থাৎ উচ্চসমাজে এই প্রথার প্রচলন ছিল কিন্তু বৃত্তিজীবী লোকসমাজে ছিল না। বঙ্গসমাজের দু'টি প্রান্তেরই সামাজিক ছবি প্রবাদটিতে উদ্ভাসিত। অথবা সতীন প্রথার অভিজ্ঞতা যে নারী সমাজে কি প্রবল গ্লানিকর অনুভূতি তার প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় এই প্রবাদটিতে,—'অশথ কেটে বসত করি/সতীন কেটে আলতা পরি।'

৩. **ঐতিহাসিক প্রবাদ** : বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে রচিত, সেগুলির মধ্যে দিয়ে অতীতের সমাজচিত্র পাওয়া যায়। যেমন, 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।'[১]

৪. **পুরাণাশ্রিত প্রবাদ** : এই প্রবাদগুলির মাধ্যমে বাঙলার লোকসমাজ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের পুরাণকাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। যেমন : 'তোমারে মারিবে যে/গোকুলে বাড়িছে সে।'[২]

৫. **স্থানাশ্রিত প্রবাদ** : কোন ভৌগোলিক স্থানের সাংস্কৃতিক পরিচয়বাহী এই প্রবাদগুলি। যেমন, 'লম্বা কোঁচা কাছ টান/তব জানবে বর্ধমান।' বর্ধমানের মানুষের পোশাক পরিধানের এই রীতি প্রচলিত।

৬. **স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রবাদ** : সাধারণ লোকসমাজে চিকিৎসকের উপদেশ অপেক্ষা প্রাথমিক ক্ষেত্রে ঐতিহ্য সূত্রে প্রাপ্ত শরীর সুস্থ রাখার বিভিন্ন প্রক্রিয়া অধিকতর গ্রহণযোগ্য। যেমন : 'কফ পিত্ত বায়/তিন নাশে পটল খায়।'

৭. **বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়-নির্ভর প্রবাদ** : কোনো লোকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এই প্রবাদগুলি থেকেও জানা যায়। 'কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফে রাজপুত/বৈদ্য চিনে তারে, যার ওষুধ মজবুত।'

৮. **দেবদেবী-আশ্রিত প্রবাদ** : লোকসমাজের ধর্মীয় জীবনচিত্রটি প্রবাদগুলিতে পরিস্ফুট। যেমন, 'কালির শোভা করে অসি/শিবের শোভা শিরে শশী।'

৯. **লৌকিক দর্শনমূলক প্রবাদ** : জীবনের বহু অভিজ্ঞতা সূত্রে লোকসমাজে জীবন ও সমাজ সম্পর্কে যে দর্শন চেতনা গড়ে ওঠে তারই প্রতিবিম্ব এই প্রবাদগুলি। যেমন : 'বিপদে বন্ধুর পরিচয়'। এই ধরনের প্রবাদের যোগসূত্র পৃথিবীর সব প্রান্তের সঙ্গেই পাওয়া যায়। এই ধরনের আমেরিকান প্রবাদটি হল : 'A friend in need is a friend indeed.' কিংবা 'সৎসঙ্গে স্বর্গে বাস/অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।' ঠিক একই ভাবার্থক প্রবাদ প্রচলিত ইংরেজিতে 'An wolf knows an wolf.'

১০. **পারিবারিক সম্পর্ক-নির্ভর প্রবাদ** : এই ধরনের প্রবাদেই নারীর জীবন-অভিজ্ঞতা অধিক গুরুত্ব পায়। বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কে নারীর যে মানসিক ও জৈবিক পীড়ন-লাঞ্ছনা, তার যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি পাওয়া যায় অধিকাংশ প্রবাদে। এই ধরনের প্রবাদে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে শাশুড়ি পুত্রবধূর তিক্ত সম্পর্ক। আপাতদৃষ্টিতে স্নেহশীলা শাশুড়ি সূক্ষ্মবোধে যে কতখানি নির্মম পীড়নকারী তা প্রতিফলিত এই প্রবাদটিতে— 'বউমা ক্ষীর রইল খাবে/যদি খাবে তো যমের বাড়ী যাবে।' অন্যদিকে, বধূর শাশুড়ির প্রতি ভক্তি (?) মনোভাবটি প্রকাশিত আর একটি প্রবাদে—'শাশুড়ী মলো সকালে/খেয়েদেয়ে যদি বেলা থাকে কাঁদবো আমি বিকালে।' মা সারাজীবন পুত্র-কন্যার জন্য উদ্বিগ্ন থাকেন, অতুল স্নেহরস লালন করেন—'মাছ চেনে গভীর জল পাখী চেনে ভাল/মায়ে জানে পুত্রের মায়া জীয়ে যত কাল।' প্রাকৃতিক উপমার মতোই মায়ের স্নেহ স্বতস্ফূর্ত। কিন্তু বিবাহিত ছেলে মায়ের সুখ-দুঃখে উদাসীন—'মা মরেন দোষ নেই বউ বাঁচলে বাঁচি।' আবার বিবাহিত কন্যার মানসিকতা পরিবর্তিত—'মা মরে ঝিয়ের তরে/ঝি মরে ভাতারের তরে।' রান্নাঘরের তথা গৃহস্থালির খুঁটিনাটি নানা বস্তুকণা প্রবাদে স্থান করে নেয় অবলীলায়। যেমন, 'হাতে হাতে দিলে নুন/যায় তার সব গুণ।' বা 'ভাত ওথলালে দিবে কাঠি, জ্বাল দিবে গুটি গুটি/তবে ভাতের পরিপাটি।' এইভাবে গড়ে ওঠে আস্বাদন-সম্পর্কিত প্রবাদ, প্রতিবেশী-সংক্রান্ত প্রবাদ। প্রবাদের মধ্যে এইভাবে লোকজীবনের প্রতিটি দিককে সহজে স্পর্শ করা সম্ভব হয়। ধাঁধা এবং ছড়ার সঙ্গে প্রবাদের গঠনরীতির একটি ঘনিষ্ঠ সাযুজ্যও দেখা যায়। তবে ভাবগত দিক থেকে অবশ্যই দূরত্ব রয়েছে। ছড়া বা ধাঁধার মধ্যে জীবনের যে সরস কোমল দিকটিও উদ্ভাসিত তা প্রবাদে অনুপস্থিত।

গ. ধাঁধা

'দ্বন্দ্ব' শব্দ থেকে ধাঁধা শব্দটি আগত মনে হয়। দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ সন্দেহ। সংস্কৃত প্রহেলিকা, প্রভালিকা, ব্রহ্মোদয় প্রভৃতি শব্দও ধাঁধার সমার্থক। পালিতে পঞ্চহ, সংস্কৃত প্রহেলিকা থেকে 'হেঁয়ালি'-র উৎপত্তি যা ধাঁধার প্রতিশব্দ। ওড়িয়াতেও পজেড়িকা, উর্দুতে পহেলিয়া বলে। পুরুলিয়ায় 'বাতকথা' কুচবিহারে 'ছিলকা', বাঙলাদেশে 'দিস্তান', শোলক প্রভৃতি নামচিহ্নিত করা হয়।[১] ধাঁধার উদ্ভব মনের কৌতূহল ও রহস্যময়তা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। লোকসংস্কৃতিবিদরা ধাঁধার উদ্ভবের কারণ হিসেবে কয়েকটি নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। আদিমসমাজে মৃতদেহের সামনে প্রত্যক্ষভাবে ভাবপ্রকাশের অন্তরায় ভাবা হত প্রেতাত্মাকে, তাই অপ্রত্যক্ষভাবে ভাবপ্রকাশের যে পদ্ধতি গৃহীত হত তা ধাঁধার প্রতিরূপ। প্রাচীনকালে গ্রিস ও রোমের বহুস্থানে ধাঁধার যুদ্ধ হত। বাইবেলে যার উল্লেখ আছে। গ্রিক পুরাণে স্ফিংসের ধাঁধার উল্লেখ রয়েছে। আদিম সমাজে বাৎসরিক পরবের দিনেও ধাঁধা প্রতিযোগিতার প্রচলন ছিল, যার মধ্যে একটি জাদুবিশ্বাস কার্যকর। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ধাঁধার মধ্যে নিহিত থাকত। মৃত্যুকালীন সংকটের সময় যেমন ধাঁধার প্রচলন ছিল, সেইরকম অনাবৃষ্টি আদিম কৃষি সমাজের অন্যতম সংকট, বৃষ্টি আনার জন্যে বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক লোক-উৎসব বা লোকাচারের অঙ্গ হিসেবেও ধাঁধার প্রচলন ছিল। লোকায়ত সমাজে বিবাহের সময়ও বর ও কন্যাপক্ষের মধ্যে ভাব বিনিময়ের প্রচলন ছিল। সুতরাং ধাঁধার উদ্ভব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই। ধাঁধার সংজ্ঞা নিরূপণে বলা যায়—ধাঁধা হচ্ছে প্রাণবাচক, গূঢ় অর্থবাহক রহস্যময় শব্দসম্ভারে পূর্ণ, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সংক্ষিপ্ততম ছন্দময় প্রকাশ। C. F. Potter Riddle-এর সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন : "A riddle, a real Folk riddle represents a group effort of some humble but intelligent people or create a little humour, or beauty or both in the rather bleak and often difficult world which they find themselves."

ধাঁধা ঐতিহ্যমূলক মৌখিক সৃষ্টি যাতে এক বা একাধিক আপাতঃবিরোধমূলক বর্ণনাত্মক উক্তি থাকে, যা রূপকাশ্রয়ী কিংবা একাধিক অর্থে গৃহীত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে ভাব বা অর্থগত কোন বিরোধ থাকে না। Archer Taylor *A Sort Verbal Puzzle* রচনাটিতে ধাঁধা সম্পর্কে বলেছেন : "Essential structure of the riddle consists of two descriptive elements, one positive and one negative—the positive element is metaphorical in a literal sense. In contrast, the negative descriptive element is correctly interpreted literally."

এই সমস্ত সংজ্ঞা থেকে ধাঁধার স্বরূপ এবং গঠন সম্পর্কে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় :

এক. ধাঁধার মধ্যে একটি পরিণত শিল্প ও রসবোধ এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধি-চিন্তার প্রকাশ থাকে যা অপেক্ষাকৃত উন্নত লোকসমাজের সৃষ্টি, অপরিণত আদিমসমাজের সৃষ্টি হতে পারে না।

দুই. লৌকিক ধাঁধাগুলি যেমন জনশ্রুতিমূলক, এদের উত্তরও জনশ্রুতি-নির্ভর। ব্যক্তিগত বুদ্ধি দ্বারা এদের মীমাংসা সম্ভব নয়।

তিন. ধাঁধা কখনই এককভাবে উপভোগ্য হতে পারে না। একজন অন্তত উত্তরদাতা থাকেই। লোকসাহিত্যের আর কোন শাখায় দু'পক্ষ এত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না। ধাঁধার উত্তরটি অবশ্য প্রশ্নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে।

চার. ধাঁধার মধ্যে রূপকের ব্যবহার থাকে, যে দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয় তা বাস্তব এবং কল্পনা মিশ্রিত সৃষ্টি।

পাঁচ. ধাঁধার দু'টি মৌল উপাদান লক্ষণীয়—অভাব এবং অভাবের অপসারণ। অথবা একটি অস্তিবাচক বর্ণনা, অন্যটি নেতিবাচক। যেমন 'একটুখানি কানি, শুকোতে না জানি।' একটুখানি কানি—অস্তিবাচক বর্ণনা। দ্বিতীয় অংশটি নেতিবাচক।

ছয়. ধাঁধার মধ্যে সম্বোধনমূলক এবং আক্রমণাত্মক ভঙ্গি থাকে। আক্রমণ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ দুই-ই হতে পারে। অনেক সময় পাদপূরণের জন্যেও আক্রমণাত্মক পদের আশ্রয় নেওয়া হয়।

সাত. বাংলা লোকসাহিত্যের মিত্রাক্ষর প্রবণতার জন্যে একপদবিশিষ্ট স্বাধীন ধাঁধাগুলিকেও মিত্রাক্ষর শৃঙ্খলে বেঁধে দেওয়া হয়। অনেক সময় এরই জন্য ধাঁধার প্রথম পদটি অর্থহীন অলঙ্কারমাত্র হয়ে মূল পদটির সঙ্গে শিথিলভাবে যুক্ত থাকে।[১]

আট. ধাঁধার অন্যতম প্রধান লক্ষণ হাস্যরস। এ বিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য *বাংলার লোক সাহিত্য* (১ম)-এ বলেছেন, "ধাঁধার ভিতর দিয়া যে কেবল পরিণত শিল্পমন ও রসবোধেরই পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহা নহে—ইহার ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম হাস্যরসবোধেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বুদ্ধির অনুশীলন কিংবা জ্ঞানের চর্চা ইহার চরম লক্ষ্য নহে, ইহার চরম লক্ষ্য নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি।"

নয়. ধাঁধার মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে জাতীয় বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির বাহন ধাঁধা।

দশ. ধাঁধা যেমন ছড়ার আকারে রচিত হয়, প্রবাদের সঙ্গেও সাদৃশ্যযুক্ত ধাঁধা গদ্যাকারেও রচিত হয়। ধাঁধাকে প্রধানত চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়—১. আধ্যাত্মিক ধাঁধা (Mystic Riddle) : ২. আচারমূলক ধাঁধা (Ritualistic Riddle) ; ৩. লৌকিক ধাঁধা (Folk Riddle) ; ৪. সাহিত্যিক ধাঁধা (Literary Riddle)। প্রথম দুটি বিভাগ মূলত সাহিত্যিক ধাঁধারই অন্তর্ভুক্ত।

সাহিত্যিক ধাঁধা : লৌকিক ধাঁধার ভিত্তির ওপরেই ব্যক্তিবিশেষের কবিত্ব ও চাতুর্যের স্পর্শে সাহিত্যিক ধাঁধার উদ্ভব হয়। লৌকিক ধাঁধার সরলরূপের ওপর অলংকার রূপকের ব্যবহারে জটিল আকারপ্রাপ্ত হয়। সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ধাঁধার ব্যবহার লক্ষণীয়। ধর্মীয় তত্ত্বকথা, নীতিশিক্ষা প্রচার, বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা এবং কৌতুক সৃষ্টির অভিপ্রায়ে সাহিত্যে সাহিত্যিক

১. 'থাল ঝন্ ঝন্ থাল ঝন্ ঝন্ থাল নিল চোরে/বৃন্দাবনে আগুন লাগল কে নিভাইতে পারে।' (মৈমনসিংহের ধাঁধা)।

আঙ্গিক অথবা বিষয়রূপে ধাঁধার প্রয়োগ করা হয়।[১] সাহিত্যিক ধাঁধাগুলি সাধারণত প্রশ্নমূলক এবং সুদীর্ঘ হয়ে থাকে।

আচারমূলক ধাঁধা : লোকজীবনে জাদুবিশ্বাস আধারিত যে সমস্ত দুর্বোধ্য মন্ত্রতন্ত্র প্রচলিত ছিল পরবর্তীকালে বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে সেগুলিই যুক্ত হয়ে আচারমূলক ধাঁধার সৃষ্টি করে। সামাজিক ও পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানে এগুলি জিজ্ঞাসা করা হত। এগুলিও প্রশ্নমূলক, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিতে বলা হয়। রামকৃষ্ণ রায় রচিত *শিবায়ন* কাব্যে শিবের বিবাহসভায় এ জাতীয় আটটি ধাঁধা কথিত হতে দেখা যায়।

আধ্যাত্মিক ধাঁধা : আচারমূলক ধাঁধাগুলির সঙ্গে ধর্মীয় জীবনের অভিজ্ঞতা-দর্শন যুক্ত হয়ে পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিক রহস্যময় ধাঁধার সৃষ্টি করে। আধ্যাত্মিক ধাঁধা অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং পরিবর্তনবিরোধী। সাধারণ মানুষের মধ্যে এজাতীয় ধাঁধা খুব বেশি প্রচলিত নয়। ধর্মীয় গূঢ়তত্ত্ব এর মধ্যে নিহিত থাকে। 'চর্যাপদ', 'নাথসাহিত্য' 'গোরক্ষবিজয়'-তে এ ধরনের আধ্যাত্মিক ধাঁধার প্রয়োগ লক্ষণীয়।

লৌকিক ধাঁধা : লৌকিক ধাঁধা লোকজীবনের প্রায় প্রতিটি বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হয়। ছন্দনির্ভর এই সৃষ্টির সঙ্গে ছড়ার সবিশেষ মিল রয়েছে শ্বাসাঘাত ও মিত্রাক্ষর প্রয়োগের কারণে। অন্যদিকে, প্রবাদের সঙ্গেও আপাত সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু প্রবাদের মধ্যে ভাবের অনুসন্ধান করা হয় আর ধাঁধার মধ্যে বিষয়ের। ধাঁধার মধ্যে নারী সমাজের অধিকারও প্রবাদের তুলনায় সীমিত। প্রবাদ তথ্যমাত্র আর রূপক-উপমার ব্যবহারে ধাঁধা অনেক বেশি কাব্যগুণ সমৃদ্ধ। লৌকিক ধাঁধার মধ্যে যে শ্রেণীগুলি দেখা যায় বিষয় অনুযায়ী সেগুলি হল—১. নরনারী ও দেবদেবী বিষয়ক, ২. প্রকৃতিবিষয়ক, ৩. পারিবারিক সম্পর্ক-নির্ভর, ৪. গৃহজীবন সংক্রান্ত, ৫. আচার-অনুষ্ঠান নির্ভর, ৬. কাহিনীমূলক, ৭. সংখ্যামূলক, ৮. বিবিধ। কৃষিজীবন সম্পর্কিত ধাঁধাটি— 'সারাদিন মাটি খায়/সন্ধ্যা হলে ঘরে পালায়।' (লাঙ্গল) বা গার্হস্থ্য সম্পর্ক নির্দেশিত ধাঁধা—'মায়ে ঝিয়ে বসে, দুই দুই পুরুষে আসে/মেয়ে বলছে বাবা আসছে, মাও বলছে বাবা আসছে' (জামাই, শ্বশুর) কিংবা 'বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন মরলে সবাই কাঁদে/বল দেখি কোন্ আত্মীয়ের মরণে কিন্তু হাসে' (সতীন)। এ জাতীয় সমস্ত রচনাতেই সমাজের অন্তস্তলকে স্পর্শ করা হলেও একটি সহজ অনাবিল হাস্যরসের আধারে সেই জীবন অভিজ্ঞতাকে পরিবেশন করা হয়েছে। জীবনের সমস্ত মলিনতা আবৃত করে ধাঁধা শৈল্পিক সৌকর্যের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

ঘ. লোকসঙ্গীত

"যাহা একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোকসমাজ কর্তৃক মৌখিক প্রচারিত হয়, তাহাকেই লোক-গীত বলে।"[২] বাঙলার লোকসঙ্গীত রূপগত এবং বিষয়গত দিক থেকে প্রভূত সমৃদ্ধ সৃষ্টি। লোকসঙ্গীত শুধু সমাজজীবন নয়, বঙ্গ-প্রকৃতির সামগ্রিক আবহকে বহন করে। লোকজীবনের অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ দু'টি দিককেই স্পর্শ করে। লোকসঙ্গীতের সাহিত্যগুণও লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা অধিক। প্রাথমিকভাবে লোকসঙ্গীতের দু'টি ধারা—লিখিত ও অলিখিত। লালন শাহ, হাসন রাজা, পাগলা কানাই প্রমুখ মরমিয়া সাধকরা লোকগানের রচয়িতা এবং সুরস্রষ্টা তথাপি এঁদের গানও ঐতিহ্যসূত্রে মুখে মুখেই প্রচার লাভ করে। সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনে লোকসঙ্গীতেরও বিবর্তন ঘটে। অধিকাংশ লোকসঙ্গীতের জন্ম ধর্মীয়

১. মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে বকরূপী ধর্মের প্রশ্নমালা। কথাসরিৎসাগরে রাজকন্যা উদয়াবতীকে বিমলাবতী ধাঁধা যুদ্ধে পরাস্ত করেন। বেতাল পঞ্চবিংশতি, জাতকের ধাঁধা। মধ্যযুগে কবি মুকুন্দের রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ব্যাধ কর্তৃক ধৃত বাকশক্তিসম্পন্ন শুকপাখীর ধাঁধাগুলি এই প্রকার—'বিধাতা নাহিক ঘরে নাহিক দুয়ার/তাহাতে পুরুষ এক বৈসে নিরাহার/যখন পুরুষবর হয় বলবান্ বিধাতার সৃজনঘর করে খান খান।' (উত্তর-ডিম)

২. *বাঙলার লোকসাহিত্য* : ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

এবং আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ; সেকারণে লোকসঙ্গীতের মধ্যে জাদুবিশ্বাসের প্রভাব অধিক। লোকসঙ্গীতের আদি উদ্ভব হল প্রাগৈতিহাসিক মানবসমাজ। মধ্যযুগ পেরিয়ে তা আধুনিক সময়কে আশ্রয় করেছে। লোকসঙ্গীত সাধারণত আকারে ক্ষুদ্রই হয়। তবে কোন কোন সঙ্গীতধারা দীর্ঘও হয়—পুনরুক্তিজনিত মূল গীতির বহির্ভূত 'ঘুয়া' অংশ এই দৈর্ঘ্যের কারণ। লোকগীতির গঠন অত্যন্ত শিথিল। বস্তুত সুরমাধুর্য সৃষ্টি মূল লক্ষ্য হওয়ায় পদগঠনের শৈথিল্য গুরুত্ব পায় না। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসঙ্গীতকে পাঁচটি শ্রেণীতে নিবদ্ধ করেন—১. আঞ্চলিক, ২. ব্যবহারিক, ৩. আনুষ্ঠানিক, ৪. কর্মসঙ্গীত ও ৫. প্রেমসঙ্গীত। তবে এই শ্রেণীবিভাগ অপেক্ষা আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লোক সঙ্গীতের শ্রেণীবিন্যস্ত করেছেন হাবিবুর রহমান তাঁর *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশে* গ্রন্থটিতে। এই বিভাজনে প্রাথমিকভাবে দু'টি শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে। ১. ধর্মীয় প্রেরণাজাত লোকসঙ্গীত ; ২. ধর্মীয় প্রেরণানিরপেক্ষ লোকসঙ্গীত।

১. ধর্মীয় প্রেরণাজাত লোকসঙ্গীত :

ক. ধর্মাচারমূলক লোকসঙ্গীত : ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পরিবেশিত এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় কর্তৃক পরিবেশিত সঙ্গীত। যেমন, বাউল, মুর্শিদি, মারফাতি প্রভৃতি। এই শ্রেণীভুক্ত বাউল গানের কাব্যধর্মও অনন্য। বস্তুত ধর্মীয় লোকসঙ্গীতেও ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা লোকজীবনের প্রাণবাণীই প্রাধান্য পেয়েছে। বাউল বাংলাদেশের এক অসাম্প্রদায়িক সর্বধর্মসমন্বয়ী মিশ্রধর্মসাধনা। বৌদ্ধ-হিন্দু-বৈষ্ণব সহজিয়া তন্ত্রদর্শন এবং সুফিধর্মের প্রভাবে বাউল-এর ক্রিয়াভিত্তিক সাধনা গড়ে ওঠে। মানবদেহ যে সাধনায় ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ, তারই মধ্যে অধিষ্ঠান করেন বাউলের 'মনের মানুষ' যিনি উপনিষদের 'পরমব্রহ্ম'। পুরুষ প্রকৃতির মিলন সাধনায় মনের মানুষের সঙ্গে সাধক বাউলের যোগ সম্ভব হয়। এই মনের মানুষ কখনো দশের মানুষ, কখনো 'শুকপাখী' কখনো বৈষ্ণবীয় প্রভাবে রসরাজ, কালাচন্দ বলে সম্বোধিত। বাউল সাধক 'মনের মানুষ' অন্বেষণে মধ্যযুগে যখন এই আকুতি প্রকাশ করেন—"আমার হলো কি ভ্রান্তি মন/আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন/দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, সুরবি লালন আত্মতত্ত্ব না বুঝে।" বিংশ শতাব্দীর বাংলা উচ্চসাহিত্যের মুকুটমণি রবীন্দ্রনাথের গানেও এই একই অন্বেষণ প্রয়াস "লোকের কথা নিসনে কানে ; ফিরিসনে আর হাজার টানে/যেনরে তোর হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—/একতারাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা।" বাউল সঙ্গীতের কাব্যগুণ এভাবেই সময়কে অতিক্রম করে। পাঞ্চশাহর আর একটি গান "দয়া কর নিমাইরূপী/আর আছে হজরত নবী/নিমাই হজরত একে ভিন্ন ছবি সাঁই একা একেশ্বর।" সাম্প্রতিক ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দূরত্ব বা বিচ্ছিন্নতা অপনোদনে লোকসমাজের কাছে এর থেকে গ্রহণযোগ্য কার্যকর বাণী আর কিছুই হতে পারে না।

খ. প্রার্থনামূলক লোকসঙ্গীত : এই সঙ্গীতগুলি কোন একটি বিশেষ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। যেমন বাঘাই শিরনী, ওগ্নি, হুলোই, হুদুমার গান, চোর চুন্নীগান প্রভৃতি। প্রতিটি সঙ্গীতধারাই কোন না কোনভাবে কৃষিজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কৃষির সমৃদ্ধি কামনাই মূল উদ্দেশ্য। যার মধ্যে Fertility cult-সংক্রান্ত জাদুবিশ্বাস কার্যকর। অনুকরণাত্মক জাদু বা হোমিওপ্যাথিক ম্যাজিক এই গানগুলির চালিকাশক্তি। যেমন উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত 'চোর চুন্নী' গান কালীপুজো থেকে শুরু করে সপ্তাহব্যাপী গৃহস্থজনের গৃহে পরিক্রমণ করে যুবকের দল গেয়ে থাকে। যে পরিক্রমার মধ্যে একজন চোর ও অন্যজন চোরনী সেজে উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে দিয়ে যেমন প্রেমবার্তা বিনিময় করে, সেইসঙ্গে সারা বছরের ঘটনাবলীর বর্ণনাও দেয়। লোকবিশ্বাস অমাবস্যার রাতে চুরি করার অভিনয় সফল হলে সারাবছর পেশাদারি কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হবে। প্রকৃতপক্ষে চোর ও চোরনীর আড়ালে কৃষক দম্পতির সমৃদ্ধি কামনা নিহিত থাকে। কিংবা জলপাইগুড়ির কৃষক রমণীরা অনাবৃষ্টিতে ঘরে হুদুমদেবতা বা বারিদেবতার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে। তাদের গানের মধ্যে রঙ্গরসিকতা থাকে, কৃষিভূমিতে নিজেদের শরীরে জল ছিটিয়ে বৃষ্টি পতনের অনুকরণ করে। কোথাও লাঙ্গলকে হুদুমা ও জোয়ালকে হুদুমানী রূপে কল্পনা করে হুদুমার বিয়ে দেওয়া হয় সেই সঙ্গে হুদুমার বিয়ের গান গাওয়া হয়, সেখানেও বৃষ্টির প্রার্থনা থাকে।

গ. স্মৃতিচারণমূলক লোকসঙ্গীত : যে সংগীতগুলি স্মৃতিতর্পণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়। যেমন জারিগান, জাগ, রয়াসী প্রভৃতি। বরিশাল-পটুয়াখালী অঞ্চলে সর্পাঘাত থেকে বাঁচার কামনায় 'রয়াসী' গান গাওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই গান 'মনসার ভাসান' নামে প্রচলিত। চাঁদসদাগর বেহুলা লখীন্দরের কাহিনী এখানে স্মরণ করা হয় মনসার মাহাত্ম্যকীর্তনের উদ্দেশ্যে। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে এ গানের শ্রোতা। বৃষ্টির শব্দের মতোই এ গানে বেহুলার বেদনার সুর গুঞ্জরিত হতে থাকে।

ঘ. কৃষিব্রতমূলক লোকসঙ্গীত : কৃষিব্রত-কেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত এগুলি। যেমন, ভাদু-টুসু, মেছেনী, পৌষ পার্বণ প্রভৃতি। উত্তরবঙ্গে মেছেনী বা তিস্তা বুড়ি এই দেবতাকে কেন্দ্র করে বৈশাখ মাসব্যাপী মেছোন গান গাওয়া হয়, যা গ্রাম বাঙলার Thief-lore-এর অংশ। ব্রতিনী মেয়েরা বাড়িবাড়ি ঘুরে তিস্তার প্রতীকমূর্তি নিয়ে এই গান করে পাথারিয়া, নামানি, বাড়ীঢুকা, রসানি, নাচানি, ভুরাভাসানি প্রভৃতি এই গানের বিভিন্ন বিপর্যয়। এই ব্রতেরও উদ্দেশ্য কৃষির সমৃদ্ধি কামনা। জনজীবনের নানা ঘটনা, নারীপুরুষের কলঙ্ক কাহিনী এ গানে প্রধান্য পায়। কৃষিব্রত সংক্রান্ত গানগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য পরিভ্রমণশীলতা ও বর্ষবিবরণী জ্ঞাপন। যেমন পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের ভাদ্রমাসের ভাদু পরব বা পৌষমাসের টুসু পরবের গানেও এই ঘুরে ঘুরে গান করার রীতি দেখা যায়। পুরুলিয়ার জাওয়া পরবের গানেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ভাদু বা টুসু গানে ধানের অঙ্কুরিত চারাকে কুমারী কন্যা কল্পনা করা হয়। নৃতত্ত্বের ভাষায় এই মানবত্ব আরোপকে animation বলা হয়। কুমারী নারী উর্বরতার প্রতীক (Virgin cult)। ঐ কন্যার বিবাহ দেওয়া, তার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া বা বিসর্জনের মধ্যে গানের সমাপ্তি। অষ্টমবর্ষীয়া ভাদুকে যেন গৌরী রূপেও ভাবা যায়। যার উদ্দেশ্যে ব্রতিনীরা গান করেন—"প্রাণের ভাদু বিদায় দি কেমন করে/সারা বছর কেদে কেঁদে গো পেয়েছি বছর পরে,/সুখের হাট ডুবাই কেমনে বিপদেরি সাগরে।" এর মধ্যে শাক্ত পদাবলীর বিজয়া সঙ্গীতের সমভাবনাই যেন প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ভাদু বা টুসু বিসর্জনের আগের রাতে 'ফলানী গান' বা 'জাগরণ' গাওয়া হয় যার মধ্যে অশ্লীল রঙ্গরসিকতারই প্রাধান্য। বস্তুত সঙ্গীতের এই ধারাগুলির পর্যায়ক্রম অনুসরণে মনে হয় নগর কলকাতার সাংস্কৃতিক আবহের প্রাথমিক স্তরে রচিত হওয়া কবি সংগীতের মধ্যে এসমস্ত লোকসঙ্গীতের প্রভাবই কার্যকর ছিল। বিশেষ করে 'কাঠি পরব', 'করম উৎসব' প্রভৃতি উপলক্ষে রচিত গীতে রাধাকৃষ্ণকেন্দ্রিক ঝুমুর গানের প্রভাব অধিকতর প্রকট।

আলোচিত লোকসঙ্গীতগুলি যদিও বিভিন্ন আঞ্চলিক বা গোষ্ঠীনির্ভর ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গীত হয় কিন্তু সংগীতগুলির মধ্যে ধর্মীয় তত্ত্ব বা আচার কখনই প্রাধান্য পায় না। বাঙলার লোকজীবনে ধর্ম যেভাবে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে সেক্ষেত্রে ধর্মকে বাদ দিয়ে সংগীত ধারা বা পর্বানুষ্ঠানগুলি গড়ে উঠতে পারে না, কিন্তু ধর্মভাবনা কখনই এই গানগুলিকে দুর্বল করেনি, বস্তুত এই গানগুলিও জীবনাশ্রয়ী। ঐশ্বরিক চিন্তা, বাউলগানের অধ্যাত্মতত্ত্ব, ঝুমুরের রাধাকৃষ্ণ লীলার মধ্যে দিয়ে আসলে মানবতার তথা জীবাত্মারই জয় ঘোষণা করা হয়। এই গানগুলি তাই কোনভাবেই শাস্ত্রীয় নয়, লৌকিক।

২. ধর্মীয় প্রেরণানিরপেক্ষ লোকসঙ্গিত :

ক. কর্মসঙ্গীত : কর্মের পরিশ্রম লাঘব করা, কর্মে উদ্দীপনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে এই গানগুলি গাওয়া হলেও আদিমকালে এই গানগুলির মধ্যে একটি জাদুবিশ্বাস কার্যকর ছিল। সমবেতভাবে কর্মের সময় গান গাইলে কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এমন বিশ্বাস ছিল। এই গানের সুর কর্মের প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একক, দ্বৈত ও সমবেত কর্মসঙ্গীত হয়ে থাকে। বিষয়ের দিক থেকে ব্যক্তিধর্মী, কিন্তু সুর তান-প্রধান। প্রশ্নোত্তরমূলক হওয়ার জন্যে গানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব থাকে। নারী ও পুরুষের জীবন ও মনের পার্থক্য ধরা পড়ে এই গানগুলির মধ্যে। কর্মগীতিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—গৃহকর্ম ও বাইরের কর্ম। পাট কাটার গান, নৌকাবাইচের গান, ধানকাটার গান, সারি গান, ছাদপেটানোর গান এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববাঙলায় পাট একটি প্রধান ফসল, পাটকে ঘিরে লোকজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার উত্থান পতন। পাট কাটার পর বাঁশতলার জলস্রোতে সেই পাট ছড়িয়ে দিতে দিতে বৌ ঝিরা গান গায়—"বাঁশতলাতে স্রোত চলেছে বইছে পানির ঢল/আয়

আয় আয় আয়রে সেই পাট বাহিতে চল্/এই পাট বেচিয়া ইবার কিন্‌মু রূপার মল/পাটে আমার ভাত কাপড় পাটে ঢাকাই শাড়ী/পাটের দৌলতে আমার যান্ বান্দা বাড়ী—আমার পায়ে রূপার মল।"

খ. পারিবারিক বিনোদনমূলক সঙ্গীত : বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে এই লোকসঙ্গীতগুলি গীত হয়। এখানে সাধারণত নারী প্রাধান্যই চোখে পড়ে। গর্ভধারণ, সাধভক্ষণ, বিবাহসংগীত এই ধারার অন্তর্গত। অপূর্ব এইসব বিবাহসংগীতে লোকসমাজে চিরাচরিত নারী-পুরুষের জীবন পরিক্রমা তথা সামাজিক মূল্যায়নের পার্থক্যটি ধরা পড়ে যার প্রযোজ্যতা এখনও অনস্বীকার্য। একটি গান এইরূপ—"মায়ের গর্ভে জনম নিল ভাই ও বহিন/তোরই লিখন তাইরে নিজ পতি ঘর/ভাইরে আমার লিখন পরের ঘর/তোরই লিখন ভাইরে দুহি দুধ ভাত/ভাইরে আমার ওরে লিখন ভাইরে সাক ভাত।"

গ. বৃত্তিমূলক লোকসঙ্গীত : এই ধরনের গানগুলি বিশেষ বৃত্তিজীবীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বৃত্তিমূলক সঙ্গীতে যেমন অনেক সময়ে ধর্মীয় প্রেরণা সক্রিয় থাকে সেই সঙ্গে এই গানগুলির মধ্যে প্রেমভাবনাও অগ্রাধিকার পায়। যেমন পটুয়া সংগীত, সাপুড়ের গান, বিরুয়া গান, সৈবালী গান প্রভৃতি। বিরুয়া গানে এই অদ্ভুত বৃত্তিজীবীদের কথা জানা যায়, যারা মাহুত। সাধারণত হাতি ধরার জন্যে বা হাতিকে পোষ মানাবার জন্য মাহুতরা গানগুলি গায়। বিরুয়া গানের সুর করুণ। উত্তর-বঙ্গের এই লোকসঙ্গীতে প্রোষিতভর্তৃকা মাহুত-পত্নীর বিরহ-বেদনার সুর শোনা যায়। একদিকে এই গানে যেমন animal lore কার্যকর, অন্যদিকে প্রেমের সঙ্গীত রূপে এর আবেদনও অনস্বীকার্য। মাহুত যেন প্রেমিক আর হস্তী-কন্যা প্রেমিকার প্রতিরূপ, উভয়ের কথোপকথনে অপূর্ব একটি রোমান্টিক আবহ তৈরি হয়—হস্তীকন্যা প্রশ্ন করে—"হাতী বান্ধিস, হাতী ছান্দিস, রে মাহুত/হাতীক নাগা দড়ি।/সইতা করি কও মাহুত/তোর বাড়ীত কয় ঝোন নারী?" মাহুত পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে উত্তর দেয়—"হাতী বান্ধো, হাতী ছান্দো, কইন্যা/হাতীক নাগাঁও বেড়ি/সইত্য করি কইলাম কইনা/বিয়াও নাহি করি।"

ঘ. প্রেমসঙ্গীত : প্রকৃতপক্ষে লোকসঙ্গীতের সবকটি ধারাকেই যেমন কৃষিজীবী আবিষ্ট করে রেখেছে, সেই সঙ্গে প্রেমের আবেদন লোকসঙ্গীতের নান্দনিকতার অন্যতম প্রকাশ। ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বারমাসী কেবলমাত্র প্রেমের লোকসংগীতরূপেই চিহ্নিত হয়। মার্জিত সাহিত্যের প্রেমচেতনা যেমন দেশকাল নিরপেক্ষ, লোকসাহিত্যের প্রেম দেশ-কাল-পাত্র সাপেক্ষ। লোকপ্রেমচতনা ব্যক্তিনির্ভর। প্রাক্-বিবাহ অপেক্ষা বিবাহোত্তর তথা বিরহের গানের আধিক্যই লক্ষণীয়। এ ধরনের গান কিছুটা দীর্ঘ এবং বিলম্বিত সুরের। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়াতে যেমন ভাবনা ঘাসের জঙ্গলে উদাসী বিরহী কখনো গরু চরাবার সময়, কখনো মহিষ নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় অলস মুহূর্তে এই গান গেয়ে থাকে। আব্বাসউদ্দীন এই গানকে সমধিক জনপ্রিয় করেছেন উচ্চ সমাজেও। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের সুরমা-মেঘনা নদী উপত্যকায়, সিলেট ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ হাওড় অঞ্চলে ভাটির স্রোতে নৌকো বাওয়ার অলসমুহূর্তে মাঝিমাল্লার কণ্ঠে শোনা যায় ভাটিয়ালি।[১] ভাটিয়ালি নদীর গান, নদীর স্রোতের মতই এর টানা সুর। বিরহিণী কর্তৃক বারোমাসের নাম ধরে গান গাইবার প্রথা সারা ভারতেই প্রচলিত। মূলত আদিম সমাজের এই গান ফসল প্রাচুর্যের কামনায় জাদু-বিশ্বাসে গাওয়া হত। বিরহিণীর দুঃখ বর্ণিত হয় বারোমাসের নৈসর্গিক এবং উৎসব-অনুষ্ঠানের আবর্তনকে কেন্দ্র করে।

ঙ. বর্ণনামূলক লোকসঙ্গীত : প্রেমের গানের বিবৃতিধর্মিতা আরও প্রাধান্য পায় এ জাতীয় সংগীতে। গাজনের গান গম্ভীরা, মেছেনী চোরচুন্নীর মধ্যে এই বিবৃতিধর্ম বা কার্যবিবরণীর পদ্ধতি গৃহীত। সাধারণত কৃষি দেবতা শিবকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীরা জাওয়া বোলান গাওয়া হয়, বোলান

গানেও এই রীতি লক্ষিত হয়। লোকসঙ্গীতের এই ধর্মকে আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদেরা লোকসাংবাদিকতা রূপে চিহ্নিত করছেন।[১]

চ. জাগরণের লোকসঙ্গীত : গণজাগরণের উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে লোকসমাজে এ জাতীয় গানের প্রচলন দেখা যায়। সামাজিক সচেতনতা লোকসঙ্গীতের অন্যতম সম্পদ। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে পূর্ববঙ্গে এই ধরনের গান বহুল প্রচারিত হয়—"ত্যজ বিলাতীবসন, বিলাতী ভূষণ, বিলাতী চিনি ও লবণ/কেহ আর কোর না গ্রহণ/আছ যত হিন্দু মুসলমান সবে হলে ভাই বুদ্ধিমান/রক্ষা করতে চাও যদি ভাই স্বধর্ম সম্মান।" আবার স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সাঁওতাল নারীর এই গানে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা ধরা পড়ে : পদদেশি দিকু গাঁয়ে গাঁয়ে বাঁধ দিব ল বলে/চুয়া পুখুর দিব ল বলে/মিছা ল বাঁধ পুকুর মিছল চুয়া/ভোট লাগি ল দিদি বার বরণ কথা বলিছে।" এই সব লোকসংগীতে একটি প্রতিবাদী মনোভাবও ধরা পড়ে।

সুতরাং বঙ্গদেশের বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীতে যে দু'টি বৈশিষ্ট্য গুরুত্ব পেতে দেখা যায় তা হল শব্দ ও ভাবের পুনরাবৃত্তি এবং প্রতীক ও সংকেতের বহুল ব্যবহার। এবং এই প্রতীক সংকেত অবশ্যই নিসর্গনির্ভর। প্রকৃতপক্ষে লোকসংগীতের এই শাখাটির মধ্যে ভাবের সাংকেতিক প্রকাশ সর্বাধিক। সেই সঙ্গে লোকসঙ্গীতের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলকতা ধাঁধার মত প্রতিযোগিতা নয়, নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে অনেক বেশি। সুরধর্ম ছাড়াও নাট্যধর্ম লোকসঙ্গীতের অন্যতম পাথেয়।

ঙ. লোককথা

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রথম Folktale-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোককথা' শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে লোককাহিনী, লোকগল্প শব্দগুলিও প্রযুক্ত হয়েছে। লোককথা হল পুরুষানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত সম্পদ, লিখিত এবং মৌখিক গদ্যের ভাষায় তা প্রকাশ করা হয়। ইতিহাস-পুরাণের নানা ঘটনা, অবিশ্বাস্য নানা বিষয় অবলম্বনে লোককথা রচিত হয়। নিচে লোককথার বিভিন্ন ভাগের পরিচয় দেওয়া হল :

১. রূপকথা : Fairy tale বা Household tale-এর সমার্থক শব্দ রূপকথা। রূপকথার মধ্যে রাজা-রানি-রাজপুত্র-রাজকন্যা, পরি এবং রাক্ষস-এর কাহিনী থাকে। রূপকথার সৃষ্টি সম্ভবত রাজতন্ত্রের শৈশবকালে। যখন রাজা-প্রজায় তেমন দূরত্ব ছিল না। পরবর্তীকালে বণিক বা সওদাগরের কথাও এসেছে। শ্রেণীচেতনা সে যুগে নিশ্চয় তেমন স্পষ্ট ছিল না। তাই উত্তরাধিকারীহীন রাজ্যে ভিনদেশী রাজকুমারকেও রাজা করা হত। কৃষিনির্ভর গোষ্ঠী থেকে বাঙলার রূপকথার উদ্ভব বলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ তথা লক্ষ্মীদেবীর প্রাধান্যের কথা জানা যায়। শ্রেণীচেতনা প্রকট না হলেও মালী পুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ বা ঘুঁটে কুড়ুনির রানি হওয়ার পথে শত বাধা অতিক্রম করতে হত। বাঙলার রূপকথায় ভীরুতার কোন স্থান ছিল না। অধিকাংশ রূপকথারই উপজীব্য ন্যায় ও অন্যায়ের সংঘাত। লোকজীবনের অঙ্গ হলেও গল্পগুলির মধ্যে বিচ্যাচর্চার কথা থাকতো, ছবি আঁকা, আলপনা প্রভৃতি লোকশিল্পের উল্লেখও পাওয়া যায়। বাস্তবত মুসলিম সারস্বত সম্প্রদায়ের দ্বারা সওদাগরদের কাহিনী এবং পরি-র গল্পগুলি বাংলাদেশে এসেছিল। ফারসি 'পর' (পালক) থেকে 'পরি' উদ্ভূত। জাদু-বিশ্বাসের প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে রূপকথাগুলি বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। রূপকথায় রাক্ষস একটি প্রধান চরিত্র। লোকবিজ্ঞানীরা মনে করেন অনার্যজাতির কুৎসিৎ আচরণের অতিরঞ্জিত চিত্রই রাক্ষসের উৎস। প্রাচীন মহাকাব্যগুলিতেও নরখাদক রাক্ষসের উল্লেখ পাওয়া যায়। Cannibalism সম্ভবত আদিম লোকপ্রথা ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'সুখ না দুঃখ' প্রবন্ধে জানিয়েছেন আদিকালে মানুষ

---

১. বলব কী গান ওহে শিব বাগানে নাই আম/গাছে গাছ বেইয়া দেখেছি/নতুন পাতা সবসমান/মনে মনে

বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আত্মীয়ের মৃতদেহ ভক্ষণ করত। মৃতদেহ চুম্বনের প্রথার মধ্যে কিংবা বঙ্গীয় জীবনে 'বাপ-মাকে খাওয়া', 'ছেলের মাথা খাওয়া' প্রভৃতি প্রচলিত বচনের মধ্যে নরখাদকতার সূত্র পাওয়া যায়। মনস্তাত্ত্বিক ধারণানুযায়ী রাক্ষস আমাদের কঠোর বিবেকের প্রতিরূপ সত্তা। সাহিত্যিক ধারণা হল, জীবনের নানা বাধার প্রতীকরূপে রাক্ষস কল্পিত। রূপকথার রাক্ষসদের মৃত্যুকল্পনায় বিশেষভাবে জাদুবিশ্বাস কার্যকর। সাধারণত রাক্ষসের প্রাণ লুকনো থাকে অন্য কোন প্রাণীর দেহে, বড় মাছের পেটে কিংবা ভ্রমরের মধ্যে। রাক্ষসের প্রাণ অন্যত্র রক্ষিত হওয়া বা অন্য প্রাণীকে প্রাণের প্রতীক রূপে গ্রহণ করাকে বলে life token, এর পেছনে নৃতাত্ত্বিক ধারণাটি হল আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল আত্মাকে দেহবিযুক্ত করা যায়, এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে আত্মাকে প্রতিস্থাপিত করাও সম্ভব। যেহেতু মানুষ স্বপ্নে নিজেকে দেখতে পায়, সেই অন্য 'আমি'র প্রত্যক্ষীকরণ থেকে আত্মাকে বিযুক্ত করার ভাবনাটি সৃষ্টি হয়েছে।

২. **রোমাঞ্চকর কাহিনী** : রূপকথার লিখিত রূপকেই রোমাঞ্চকর কাহিনী বলা হয়েছে। যেমন আলিফ লায়লার গল্প, বোক্কাচিও-র ডেকামেরনের গল্প। লোকসাহিত্য-গবেষক স্টিথ টমসন এদের বলেছিলেন Novella. ড. আশরাফ সিদ্দিকী এর বাঙলা করেছেন রোমাঞ্চকর কাহিনী।

৩. **বীরকাহিনী** : Hero Tale-এর বাঙলা প্রতিশব্দ 'বীরকথা' বা 'বীরকাহিনী'। এসব কাহিনীর নায়কেরা অতিপ্রাকৃত শক্তিসমূহকে পরাস্ত করতে সক্ষম। যেমন হারকিউলিসের গল্প।

৪. **স্থানিক কাহিনী** : Saga বা local legend-কে স্থানিক বা আঞ্চলিক কাহিনী বলা হয়েছে। এসব গল্পের নায়কেরা ভূতপ্রেত, পীর, জলদেবতাদের পরাস্ত করেন। লোকবিশ্বাসভূত এসব কাহিনী একেবারে অসম্ভবের মাত্রা স্পর্শ করে। কখনো ঐতিহাসিক ঘটনাও এর মধ্যে সম্পৃক্ত থাকে। আঞ্চলিক লোকবিশ্বাসই এখনে গুরুত্ব পায়।

৫. **ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী** : লোকবিশ্বাসসম্ভূত এসব কাহিনী আঞ্চলিক প্রতিবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক, সাংসারিক বিষয়গুলি এসব গল্পের প্রতীকীকাহিনী বিশ্লেষণে জানা যায়। যেমন, কচ্ছপের খোলের মধ্যে জ্ঞানভাণ্ডার থাকার কাহিনী।

৬. **পুরাণকাহিনী** : Myth বা পুরাণ অতীত বিশ্বের কাহিনী, সেখানে দেবতা বা দেবতাসুলভ নায়কের উৎপত্তি ও কর্মজীবন বর্ণিত থাকে। ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচার এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। সৃষ্টির লীলারহস্যও এখানে বর্ণিত হয়।

৭. **জীবজন্তুর কাহিনী** (animal tale) : জীবজন্তুদের ওপর মানবিকতা আরোপ করে এই পুরাণকাহিনী গড়ে ওঠে। এ ধরনের লোককথাকে উপকথাও বলে। এইসব গল্পে চালাক জন্তু বোকা জন্তুকে পরাস্ত করে।

৮. **নীতিকাহিনী** : জীবজন্তুর গল্পে যখন নীতির সুর সংযোজিত হয় তখন তাকে নীতিকাহিনী বা fable বলে। যেমন ঈশপের গল্প, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ এ জাতীয় রচনা।

৯. **হাস্যরসাত্মক কাহিনী** : পৃথিবীর সর্বত্র ছোট ছোট হাসি-কৌতুকের লোককাহিনী প্রচলিত থাকে। এগুলিকে Humorous Anecdotes বা Merry Tales বলে। লোকঠকানোর উদ্দেশে এই গল্পগুলি বলা হয়। অনেক সময় কোন নায়ক বা নায়িকাকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট কাহিনীর ধারাবাহিকতা গড়ে ওঠে। যেমন গোপাল ভাঁড়ের গল্প।

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যে বিচিত্র লোককথা প্রচলিত রয়েছে যেহেতু তাদের মধ্যে বহু সাদৃশ্য থাকে এই কারণে লোককথা সংগ্রাহকরা সেগুলিকে সমীক্ষা এবং সংগ্রথিত করার জন্য দুটি একক আবিষ্কার করেন। লোককথার অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য তথা type এবং উপাদান বা উপকরণ ভেদে কাহিনীগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করার একক বা motif। সাধারণভাবে লোককথার মধ্যে যে গঠনগত বিশেষত্বগুলি চোখে পড়ে, সেগুলি হল :

এক. কাহিনীর আরম্ভে থাকে একটা অভাববোধ, শেষ হয় অভাব পূরণের দ্বারা। যেমন, রাজা রানি নিঃসন্তান। শেষে রাজপুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

দুই. পুনরাবৃত্তি। ভাষাগত পুনরাবৃত্তি ছাড়াও যুগ্ম চরিত্র থাকে, যাদের স্বভাব বিপরীত। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় তবে ফল হয় পৃথক। যেমন সুখুদুখুর গল্পে বা কাঠুরে জলদেবতার গল্পে দেখা যায়।

তিন. তিনের পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়। অর্থাৎ তিন ডুব দেবে না, তিনবার ডিঙোবে না। জলদেবতার গল্পে তিনি তিনবার কাঠুরেকে কুঠার দেখান।

চার. রূপকথায় কেবল মূল কাহিনী থাকে। উপকাহিনী থাকে না।

পাঁচ. জ্যামিতিক প্যাটার্ন হয় এবং টাইপচরিত্র সন্নিবেশে গড়ে ওঠে। আধুনিক নাটক বা উপন্যাসে টাইপ চরিত্রের আগমন লোককথা থেকেই।

ছয়. লোককাহিনীর অন্যতম নন্দনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল কতকগুলি অসংলগ্ন কাহিনীর গ্রন্থনা এবং লোকমানসের যুক্তি শৃঙ্খলাবোধের অভাব।

সাত. Tabu অর্থাৎ সতর্কতামূলক বিধিনিষেধ লোককথার অন্যতম উপকরণ। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং বিশ্বাসমূলক Tabu সংযোজিত হয়। বাঙলার লোককথার অন্যতম শ্রেণী ব্রতকথায় Tabu-র প্রয়োগ অধিক। Tabu-র সঙ্গেই থাকে Totem বা কুলপ্রতীক বা গোত্রদেবতার প্রসঙ্গ। যেমন লোকজীবনে Totem প্রাণী হত্যা করা নিষিদ্ধ, যেমন সাঁওতাল গোষ্ঠীর হাঁসদাগোত্রের লোকেরা পাতিহাঁস হত্যা করে না।

সর্বোপরি উল্লেখ্য যে, লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির তুলনায় লোককথা অনেক বেশি বিচিত্র ও সমৃদ্ধ হলেও নারী অপেক্ষা পুরুষের কর্তৃত্ব এই শাখাটিতে অধিক।

চ. গীতিকা

লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির তুলনায় গীতিকা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের সৃষ্টি। বাংলা গীতিকাও সম্ভবত অন্ত্য-মধ্যযুগের সৃষ্টি। ইংরেজি Ballad আমাদের দেশে গাথা বা গীতিকা নামে পরিচিত। ইতালীয় *ballare* থেকে ইংরেজি Ballad শব্দটি আগত। ব্যালাড বলতে বোঝায় নৃত্যযুক্ত কাহিনী-নির্ভর সঙ্গীত। মধ্যযুগের শেষদিকে ইংল্যাণ্ড-জার্মানি-ফ্রান্স এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে প্রণয় ও বীরত্বমূলক ব্যালাড রচিত হয়েছিল। নানা জনে গ্রন্থন করে বলেই সম্ভবত 'গাথা' নামটি দেওয়া হয়েছে। পালি এবং প্রাকৃতেও গাথা শব্দটি আছে। যার অর্থ আখ্যানমূলক কবিতা। ইংরেজি ব্যালাডের সঙ্গে বাংলা ব্যালাডের মূল পার্থক্য হল বাঙলা গীতিকাগুলি ইরেজি ব্যালাডের তুলনায় দীর্ঘ ; এবং ইংরেজি ব্যালাডগুলি ঘটনাপ্রধান আর বাংলা গীতিকাগুলি বর্ণনাপ্রধান। বাঙলা গীতিকার কাহিনী দীর্ঘবিরতিহীন, বিয়োগান্তক পরিণতিনির্ভর অধিকাংশ কাহিনী, উপকাহিনীর সংখ্যা একাধিক। চরিত্রসংখ্যাও বহু তবে সব চরিত্র পরিণতি অর্জন করে না। বাঙলা গীতিকাসাহিত্যের দুটি ধারা দেখা যায়—১. গোপীচন্দ্রের গান বা নাথ গীতিকা ; ২. মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা। নাথ গীতিকাগুলি নাথ গুরুদের অলৌকিক শক্তি প্রচারের জন্যে রচিত আর মৈমনসিংহ গীতিকাগুলিতে পূর্ব মৈমনসিংহের দিগন্ত বিস্তৃত হাওর, অরণ্যবেষ্টিত ভূমি, বিল-নদী অধ্যুষিত নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের লোকজীবনের কাহিনী। এখানকার আঞ্চলিক উপজাতি বোড়ো, হাজং, রাজবংশী, গারো। এদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, স্বাধীনভাবে পতি গ্রহণ, বয়সকালে বিবাহ, স্বাধীন প্রেম প্রভৃতি সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিকৃতি এই গীতিকাগুলি। গীতিকার কাহিনী নারী মনস্তত্ত্ব নির্ভর। উচ্চসমাজের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে এই গোষ্ঠীভুক্ত মেয়েদের প্রেমসম্পর্ক স্থাপনে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু উচ্চসমাজের রক্ষণশীলতা যখন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত তখন তাদের জীবনে যে pathos নেমে আসতো তারই করুণ বর্ণনা এই কাহিনীগুলি। গীতিকার নারীচরিত্রগুলির মধ্যে গৃহজীবনের পাশাপাশি একটি বহির্জীবন, কর্মীজীবন তথা রোমান্টিক আবেশ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যা লোকসাহিত্যের অন্যান্য নারী চরিত্র গুলির তুলনায় আধুনিক। বস্তুত বাঙলা গীতিকার কাহিনী বন্ধনের মধ্যে আধুনিক গল্প ও উপন্যাসের বীজকে অনুভব করা যায়। মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী সোনাই-এর গীতিকা বাঙলার লোকসমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

ছ. লোকনাটক

গীতিকার মধ্যে যে নাটকীয়তা, লোকনাট্যগুলির মধ্যে তা আরও ঘনীভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে লোকসাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই নাটকের বা অভিনয়রীতির প্রভাব লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এমনকি ছড়া, প্রবাদ কিংবা ধাঁধার উক্তি-প্রত্যুক্তি বিনিময়ের মধ্যে বা লোকসংগীতের আবহসৃষ্টির মধ্যে এই অভিনয়কলা চোখে পড়ে। যেমন মেছেনী, চোরচুন্নী, হুদুমার গানে নাট্যরীতিকে অনুভব করা যায়। তবে গীতিকাব্যই লোকনাটকের আদিস্তর বলা চলে। লোকনাট্য বাক্‌কেন্দ্রিক এবং অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক অনুকৃতিমূলক লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। লোকসমাজই এর স্রষ্টা। এর বিষয়বস্তু ঐতিহ্যাশ্রয়ী বা দৈনন্দিন জীবননির্ভর। যেমন প্রান্ত উত্তরবঙ্গের কুশান, শিবযাত্রা, বিষহার প্রভৃতি পালার বিষয় রামকথা, শিবকথা, মনসা পুরাণকথা। অন্যদিকে প্রান্ত উত্তরবঙ্গের মুখাখেলা, রঙপাঁচালী, খাস পাঁচালী, মুর্শিদাবাদের আলকাপ বা মালদহের গম্ভীরা-র মধ্যে দৈনন্দিন জীবনচিত্রই অঙ্কিত। লোকনাট্য একটি মিশ্রমাধ্যম। সেখানে গদ্য-পদ্য দুই-ই ব্যবহৃত হয়। নৃত্য, গীত, গদ্য সংলাপ, ছড়ার মিশ্রণে লোকনাট্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। ছৌ এবং মুখা-খেলায় মুখোশ ব্যবহৃত হয়।

বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রন্থে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকনাটকের সংজ্ঞা নির্দেশ করে লিখেছেন, ''লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক।'' লোকনাটকের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে সেগুলি হল—

এক. লোকনাটকের কোন লিখিত রূপ থাকে না। ফলে বিষয়ভাবনার মধ্যে আংশিক পরিকল্পনাহীনতা চোখে পড়ে। একই কাহিনী সময় এবং অঞ্চলভেদে ভিন্নরূপে অভিনীত হয়।

দুই. লোকনাটকে মঞ্চ থাকে না। দর্শক এবং অভিনেতা একই ভূমিতে অবস্থান করেন। অভিনেতা এবং দর্শক একই সামাজিক শ্রেণী ও রুচিনির্ভর হওয়ার জন্য তাঁদের মধ্যে কোন দূরত্বের বোধ থাকে না। এই কারণে লোকনাটক দ্রুত জনসংযোগের কাজ করতে পারে।

তিন. লোকনাটকের সংলাপ তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয় বলে তা দীর্ঘ হয় না, জটিল বাক্য থাকে না।

চার. অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজন খুব বেশি সংখ্যক হয় না। প্রতিটি দৃশ্যে চরিত্র সংখ্যাও কম থাকে। নারীচরিত্রের তুলনায় পুরুষচরিত্রের সংখ্যা বেশি থাকে। নারীর ভূমিকায় পুরুষ অভিনেতারাই অভিনয় করে থাকেন।

পাঁচ. সাজসজ্জার কোন বাড়াবাড়ি থাকে না। সাধারণ পোশাকেই কুশীলবেরা অভিনয় করেন।

ছয়. কোন প্রযুক্তিগত শৈলী এখানে ব্যবহৃত হয় না। এমনকি মাইক্রোফোনের ব্যবহার থাকে না।

সাত. লোকনাটকে লোকবাদ্যের প্রয়োগ হয়। সঙ্গীত পরিচালকের তেমন কোন অনুশীলন থাকে না। লোকনাটকে নাচ এবং গানের ব্যবহার বেশি থাকে। তবে গানের সুর জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের অনুকরণে রচিত হয়। সাধারণত গান আগে থেকে তৈরি থাকে কিন্তু গদ্য সংলাপ তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি হয়।

আট. লোকনাটকের একটি আঞ্চলিক রূপ থাকে। যেমন দক্ষিণবঙ্গে অভিনীত হয় বনবিবির পালা। কোচবিহারে কুশল পালা। নদীয়ায় বোলান এবং অষ্টক ; বর্ধমান, বীরভূমে লেঠো, মালদহে গম্ভীরা, মুর্শিদাবাদে আলকাপ, রঙপুর জলপাইগুড়িতে জাগের গান প্রভৃতি।

নয়, লোকনাটকে একজন অভিনেতা কোনরকম সাজসজ্জায় পরিবর্তন ছাড়াই একাধিক চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন।

লোকনাটকের মূল উদ্দেশ্য হল, বিনোদন, ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানো, তথ্যপরিবেশন করা এবং জনমত গঠন করা। শেষোক্ত দুটি উদ্দেশ্যের জন্য লোকনাটকের মধ্যে লোকসাংবাদিকতার ধর্ম খুঁজে পাওয়া যায়। যে কারণে লোকনাটককে লোকসমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা

যায়। লোকনাটকের উৎসসন্ধানে নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন বিভিন্ন অণুকরণাত্মক জাদু অনুষ্ঠান এর পূর্বসূরী। কৃষিনির্ভর জাদু অনুষ্ঠান, ওঝা গুণীনদের ব্যাধিমুক্তির জাদু অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সাদৃশ্যমূলকতা আনার জন্য যে অভিনয় করা হয়ে থাকে তারই মধ্যে আছে লোকনাট্যের অঙ্কুর। শুধু তাই নয়, 'গাছ গাছুয়া ছড়া', 'চাষী ও চাষী বৌ' প্রভৃতি বাল্যক্রীড়ার মধ্যেও যেভাবে প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়া প্রযুক্ত হয় তার মধ্যেও লোকনাট্যের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং লোকনাট্য যেমন লোকসাহিত্যের প্রতিটি শাখার ভিত্তিভূমি অবলম্বনে রচিত সেইভাবে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক দু'ধরনের লোকনাটকই সমগ্র লোকজীবনের ঐতিহ্যানুসারী একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। কৃষি সমাজই এর মূল উপজীব্য তবে লোকসাহিত্যের অন্য শাখাগুলির মতো এতে শুধুই নারীপ্রাধান্য লক্ষিত হয় না

জ. লোকসাহিত্যের ভবিষ্যৎ

লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান শাখারূপে লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি অংশের সঙ্গে সেতুবন্ধনে যুক্ত। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপশাখাগুলির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং অভিযোজনভিত্তিক বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে একথা অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে যে, লোকসাহিত্য শুধু ঐতিহ্যানুসারী সৃষ্টিই নয়, তা সর্বকালিক এবং সর্বজনীন। লোকসাহিত্য তার উৎসকেন্দ্র তথা সামাজিক গোষ্ঠীর গভীর অন্দরমহলে প্রবেশে সক্ষম। লোকসাহিত্যের দৃষ্টিকোণ অণুবীক্ষনিক। যেহেতু লোকসাহিত্য 'Living Traditional Culture' সেকারণে ঐতিহাসিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব, পরিবর্তিত পরিবেশের সংঘাত এবং সংস্কৃতির সংযোগ-সংশ্লেষ-সঞ্চরণের পথে লোকসংস্কৃতির রূপান্তর-প্রবণতা তথা পরিবর্তনসাধন একান্তরূপেই অনিবার্য। লোকসমাজ যত সময়ের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছে কালধর্মের গতিশীলতা এবং পরিবর্তমানতার ধর্মানুযায়ী লোকসমাজে দেখা দিয়েছে 'আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা', 'সামাজিক বিচ্ছিন্নতা', 'মানসিক বিচ্ছিন্নতা'। এইসব বিচ্ছিন্নতা, সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যার ফলে লোকসাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতির স্বাভাবিক গতিশীলতা ব্যাহত হয়। এই সমস্ত ব্যবধান দূর না হলে লোকসমাজের মধ্যে দেখা দেয় কূপমণ্ডুকতা এবং জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে সৃষ্টি হয় অসঙ্গতি, বিকৃতি ও সংকট। বাঙলার লোকসমাজে সামাজিক দূরত্ব একটি বৃহৎ সমস্যা, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়গত সামাজিক বৈষম্যই এই বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে। তবে 'সামাজিক দূরত্বের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন জাতিবর্ণের মানসিক প্রসার অনেকটা রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু অ্যাকালচারেশনের বৈচিত্র্য সেই দূরত্বাবসানে বা 'সোশ্যাল ডি ডিস্ট্যান্টিয়েশনে' বেশ খানিকটা সাহায্যও করেছে। 'অ্যাকালচারেশন'-এর ধর্মই তাই।'[১] এই অ্যাকালচারেশনের জন্যেই বাঙলার লোকসাহিত্যের অগ্রগতিতে সৃষ্টি হয়েছে লোকায়ত সাহিত্য ; কবিগান, পাঁচালী, যাত্রা, আখড়াই, বাউল প্রভৃতির মধ্যে এই লোকায়ত সাহিত্যের প্রসার। লোকায়ত সাহিত্য পুরোপুরি লৌকিক না হয়েও লোকমানসের নিজের এবং লৌকিক জীবনাশ্রিত স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীলতায় লৌকিক-ঐতিহ্যে সমন্বিত। লোকায়ত বা প্যারাফোকলোর ঐতিহ্যানুসারী লোকসাহিত্যকে সজীব রেখেছে। সেইজন্যই গ্রামীণ সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি থেকে যখন এই নগর কলকাতার জন্ম হয় তখন নাগরিক সংস্কৃতির মধ্যে, ঊনবিংশ শতকের আধুনিকতার প্রত্যূষপর্বে কবিগান, পাঁচালী, আখড়াই বা টপ্পার মধ্যে খুঁজে পাই— কখনো গ্রামবাঙলার উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক ছড়া-ধাঁধা-সঙ্গীতের ঐতিহ্য, কখনো পাঞ্জাব অঞ্চলের লোক সুর। প্রথম আধুনিক কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার বৃহত্তর পর্বকে অধিকার করে থাকে লোকসাহিত্যের প্রবাদ-প্রবচন বা ছড়ার শ্বাসাঘাত-ছন্দোময়তা। যেমন একদা নিজের দেশীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মাও-দে-জঙ্গ বলেছিলেন, 'The future of Chinese poetry is folksongs first and the classics second.' এইভাবে ড. মবহারুল ইসলামও বলেন, ''ফোকলোর জনগণের ঐতিহ্যের

১. সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব : বিনয় ঘোষ